আমাদের রাজনীতি ও জনশিক্ষা

শিক্ষা বলতে আমি এখানে লেখাপড়াকে বোঝাতে চাইনে। এটুকু সবাই বুঝি যে, লেখা ও পড়ার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছুর শিক্ষা অর্জন করি, জীবন ও সমাজ পরিচালনা করতে শিখি। এর অর্থ এই নয় যে, লেখাপড়া মানেই শিক্ষা। অনেকেই আছেন, হয়তো-বা এমএ পাশ করতে গিয়ে অনেক লিখতে ও পড়তে হয়েছে, তার চিন্তাভাবনা ও কাজের মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু না থাকলে তাকে শিক্ষিত লোক বলবো কী করে! শিক্ষিত লোক হতে হলে তাদের মধ্যে জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মনুষ্যত্ববোধ-জাগানিয়া শিক্ষা থাকতে হবে।

একটা গাভী গরু সদ্য একটা বাছুর প্রসব করল। বাছুরটা কমপক্ষে একঘন্টা মাটিতে শুয়ে থেকে উঠে গাভীটার কাছে এসে গাভীর স্তন থেকে দুধ খাওয়া শুরু করে দিলো। বাছুরটাকে কে শিখিয়ে দিলো যে, ঐ স্তনের মধ্যে তার খাবার লুকিয়ে আছে? প্রকৃতিও প্রতিনিয়ত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। প্রারম্ভ থেকে আমৃত্যু আমরা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিই। সমাজ ও পরিবেশ থেকে আমরা বেশি শিক্ষা নিই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও আমরা শিক্ষা নিই। অনেক দিন থেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অনেক দর্নীতিবাজ, লেখাপড়া জানা চোর-ডাকাত, ধাপ্পাবাজ, প্রতারক বেরিয়ে আসছে। তারা এ সমাজেই চলাফেরা করছে। তাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এগুলো আমরা বিবেচনায় আনছিনে বলে নীতিহীন-রাজনীতির স্পর্শে এদেশে দুর্নীতি, প্রতারণা, মিথ্যাচার ও অমানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এদের গুরুর সংখ্যাও বেড়েছে। আমাদের বুঝতে হবে এই দুর্নীতি, প্রতারণা, সর্বৈব মিথাচার, ব্যাংক-লুট, টাকা-পাচারের উৎস কোথায়। একবাক্যে সবাই বলবেন– আমাদের রাজনীতি। এদেশে সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা দুটোই আমরা সমাজ ও পরিবেশ থেকে নিই। কারণ আমরা সমাজ ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে জীবন পরিচালনা করি। সমাজ ও পরিবেশ আবার দেশের বিদ্যমান রাজনীতির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। রাজনীতির আচর-আচরণ ও শিক্ষা সমাজ ও পরিবেশের ভিত নির্মাণ করে। রাজনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটা দেশের প্রতিটি বিষয়কে প্রভাবিত করে। আমি একটা দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে শুধু রাজনৈতিক দলরূপে দেখিনে; এগুলোও এক-একটি সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, এদেশে যত জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন– নির্বাচন কমিশন, দুদক, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ– এমন আরো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, সবই সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; যেখান থেকে এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত সেবা ও শিক্ষা নেয় এবং সেই শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করে। এরা এদেশের মানুষকে সুশিক্ষা প্রদানে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে এটাই বিবেচ্য বিষয়। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এ জনগোষ্ঠীকে কেমন ও কী শিক্ষা দিচ্ছে আমরা কেউ কখনো একটু ভেবে দেখি কি? আরেকটা বিষয় হচ্ছে, একটা দেশের রাজনীতি যদি সুস্থ ও সুন্দর হয়, তাহলে অন্যান্য এজেন্সিও শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করে। সমাজে যখন ন্যায়বিচার, সততা, নীতিবোধ, মানবতার চর্চা হয়– তখন সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের ভূমিকাই-বা এদেশে কেমন? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে, এদেশের যত দুর্নীতি, অবিচার, সন্ত্রাস, অনৈতিক কর্মকাণ্ড, আর্থিক লুটপাট, উদগ্র মিথ্যাচার, অসৎ ব্যবসা, জিব উল্টানো– এসবের সুতিকাগার কোথায়? এগুলো করে আমরা সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী পেতে চাই, জাতির উন্নতি করতে চাই, সুন্দর দেশ গড়তে চাই– কীভাবে তা সম্ভব? এমন মুখের সুবচন কতক্ষণ আমরা মেনে নেবো? এ অসম সমীকরণ কোনোভাবেই মিলবে না।

দেশ পরিচালনায় যখন যে সরকারই আসুক, কেউই নিজেদের বাড়ি থেকে সম্পদ এনে দেশের উন্নতির জন্য খরচ করে না। এটা বাস্তবসম্মতও নয়। এদেশের জনগণের কাছ থেকে কর বা অন্যান্য উৎস থেকে সরকারি কোষাগারে যে অর্থ জমা হয়, তা-ই সরকার দেশের উন্নয়নে ব্যয় করে। কখনো প্রয়োজনে বাইরের কোনো উৎস থেকে সরকার ঋণও নিতে পারে। বিবেচনার বিষয়টা হচ্ছে, যেভাবে সরকারের আয় অর্জিত হওয়ার কথা, তা যথাযথভাবে অর্জিত হচ্ছে কি না, কিংবা একটা শ্রেণি সরকারি আয় ফাঁকি দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে কি না। অন্যদিকে সরকারি ব্যয়ের যথার্থতা আছে কি না। জনসেবার জন্য একশ টাকার জিনিস পেতে পাঁচশ টাকা

কোষাগার থেকে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে কি না। যদি অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে যায়, তাহলে জনসাধারণের টাকাই অপচয় হচ্ছে। টাকার এই জমা-খরচ ছাড়াও সরকারি দল ও অন্যান্য আরো দলের মূল কাজটা হলো জনগণের সেবা করা, বা কল্যাণ করা। যে দল জনগণকে যত সেবা করবে, জনগণ সে দলকে তত ভালো চোখে দেখবে, তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। এসবই আমার মতো সাধারণ মাস্টারের সাধারণ ও সহজ-সরল বুঝ।

সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে'। রাজনীতির অবস্থা তা-ই। এদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই মাস্টারসাহেবদের এই সাধারণ-সরল বুঝ নিয়ে এদেশের শক্তিধর 'মহান রাজনৈতিক দলগুলো' চলছে না। তাদের মাথায় ভিন্ন ও চতুর বুদ্ধি গজিয়েছে, পাখা উঠেছে। তারা চাতুরতা, কথার মারপ্যাচ ও জিব ঘুরিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে সুবিধাবাদী রাজনীতির পণ্য মানুষকে গেলাতে চায়। প্রকারান্তরে ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থের জয়গান গায়। সাধারণ মানুষকে এই চতুর বুদ্ধি থেকে বের করে আনার জন্য ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার রাজনীতিতে বিভিন্ন উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাময়িক সময়ের জন্য রোগের কিছুটা উপশমও হয়েছিল, স্থায়ী সমাধান কেন জানি হচ্ছে না। আমার মনে হয়, আমরা কারণগুলোর মূল উৎপাটন করছিনে বলে রোগ যাচ্ছে না। অদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও কোনো আশার আলো দেখছিনে। আমি কিন্তু এহেন সমস্যার সমাধান নেই, একথা মানতে নারাজ। এ বিষয়ে গ্যারান্টিও দেওয়া যায়। ছোট্ট একটা দেশের ম্যানেজমেন্ট করা, কী-বা এমন বিষয়! দরকার একদল সুশিক্ষিত উদ্যমী লোক সাথে নেওয়া, তাদের আত্মবিশ্বাস ও নির্ভেজাল সদিচ্ছা। একথা অনেকে অস্বীকার করবেন, আবার কেউবা আমার প্রতি রুষ্ঠ হবেন, তবুও আমার সত্য পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, এদেশের রাজনীতি দেশের শিক্ষা, সমাজ ও দেশ গঠনে একটা বিষবৃক্ষের মতো কাজ করছে। রাজনীতি হয়ে উঠেছে গোষ্ঠী-সুবিধাবাদী সংগঠন। এখান থেকে সাধারণ মানুষ, সমাজ ও দেশ বিষফল ছাড়া ভালো কিছু পাচ্ছে না। পশ্চিম-পাকিস্তানিদের শোষণের ঘানি টানতে গিয়ে তেইশ বছরে আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, মনেও বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। বায়ান্নটা বছর হলো সে নাগপাশ থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু 'কোথা থেকে কখন যে কি হয়ে গেল, সাজানো ফুলের বনে ঝড় বয়ে গেল'। ভাবতেই অবাক লাগে!

প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্সশীট মেলানো আমার কাজ ও পেশা। মহান রাজনীতিকদের দেবতা জ্ঞানে চলাফেরা করি। কিন্তু এখন দশের ব্যালান্সশীট মিলাতে গিয়ে হিসাব করে দেখতে পাচ্ছি, 'শোষণের দেবতা (শোষক) স্বয়ং নিজের ঘরে ঢুকে বসে আছেন।' এদেরকে তাড়াবো কোথায়? দেবতাকে তো গালিগালাজ করতে পারিনে, অদৃষ্টকে দোষারোপ করি, আর বলি, 'হায় হতোস্মি, এই কি ছিল তোর ভাগ্যের লিখন'! রাজনীতির উদ্দেশ্য পালটে গেছে, জনসেবা আর করতে চায় না, রাজনীতি জনসেবার মোড়কে দেশকে নানা ফন্দি-ফিকিরে শোষণ করতে চায়। আমরা কেউ কেউ একথা মুখে অস্বীকার করলেও বাস্তবে অস্বীকার করার জো নেই। স্বাধীনতার পর থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই-ই দেখে আসছি। দিন যত সামনে এগোচ্ছে শোষণের মাত্রা তত বাড়ছে, ধরণ ও টেকনিক পালটাচ্ছে। যারা এখান থেকে উপকৃত হচ্ছে, তারা জয়ধ্বনী দিয়ে শোষণের এ ধরণকে সাপোর্ট করছে এবং এ ধরণের রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করছে। সাধারণ মানুষের করণীয় তেমন কিছু নেই। এদেশের মানুষ বা গোষ্ঠীর এহেন সুবিধাবাদী বৈশিষ্ট্য যদি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও থাকতো, তাহলে মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে দেশ স্বাধীন হতো কি না সন্দেহ। তখন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গিয়ে সামষ্টিকভাবে দেশের স্বার্থে একজোট হয়েছিল। শতকরা আটানব্বই ভাগ মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তানি শক্তি বিভিন্ন ব্যক্তি-সুবিধা দিয়ে কিনতে পারেনি, অথচ এখন কোনো কোনো রাজনৈতিক দল অর্থ কিংবা পদের সুবিধা দিয়ে জনগোষ্ঠীর একটা ক্ষমতাশালী শক্তিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারছে। রাজনীতিতে টাকার খেলা শুরু হয়েছে। দেশের সামষ্টিক স্বার্থ এখন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে রূপ নিয়েছে। আমার এসব খাপছাড়া কথা শুনলে কারো কারো গাত্রদাহ হতে পারে, কিন্তু এগুলো নির্ভেজাল সত্য কথা।

বেশ কয়েকদিন আগে দক্ষিণবঙ্গ থেকে পদ্মাব্রিজ হয়ে ঢাকায় এলাম। বেশ ভালো লাগলো। বুকটা আনন্দে ভরে গেল। চারদিক তাকিয়ে দেখলাম, নদীর এককূল ভাঙছে, অন্যকূল গড়ছে। আমি ব্রিজটা মাথায় করে বাড়িতে নিয়ে

আসিনি। তৈরিকৃত ব্রিজ থেকে সেবা নিয়েছি মাত্র। মানুষ সমাজে বেঁচে থেকে সেবা ও পণ্য ভোগ করে। অবকাঠামোগত এ উন্নয়নের মাধ্যমে এ সেবাই শুধু জীবনে বেঁচে থাকা, সুষ্ঠু সমাজ গঠন, জাতি গঠন, মানবসম্পদ গঠন নয়; আরো আরো শতেক সেবা ও পণ্য ভোগ মানুষকে করতে হয়, যার উন্নয়ন মানুষের ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। এদেশের রাজনীতিতে তো দুকূলই ভেঙে যাচ্ছে। সেখান থেকে মানুষ ও সমাজ সেবা পাবে কীভাবে? বছরের পর বছর সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছি, রাজনীতিকদের জনসেবা কথাটা রাজনীতির অভিধানে থাকলেও বাস্তবতা থেকে বেমালুম মুছে গেছে। গ্রামগঞ্জের কোথাও গিয়ে নেতা-কর্মীদের কাউকে আর জনসেবা করতে দেখিনে, সবাই নিজ সেবায় মত্ত। এক সময় দু-চার গ্রাম খুঁজে একজন সোস্যাল টাউট পাওয়া যেত। এখন যুগ পালটেছে। প্রতিটা গ্রামে-গঞ্জে অবস্থাভেদে দশ-বিশজন পলিটিক্যাল টাউট চোখে পড়ে। বিশ্বাস করুন, আমার এ দেখা ভুল নয়, আমি বেশি পাওয়ারের চশমা পরি। রাজনীতি দেশের যেদিকেই হাত বাড়াচ্ছে, সেদিকটাই দুর্নীতি-দুরাচারদের বিষের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। রাজনীতির বিষবাষ্প সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে গলা টিপে শেষ করে দিয়েছে। সত্যকথা বলা লোক সমাজে ক্রমেই কমছে। যেভাবেই হোক একটা নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ না। আমরা এই বায়ান্ন বছর ধরে দেখছি, বেশীরভাগ দুর্নীতিবাজ, অসৎ ব্যবসায়ী, সামাজিক দুরাচার, চিহ্নিত মাস্তান, পেশিশক্তির ধারক, চাটুকার সরকারি কর্মকর্তা সব সময় ক্ষমতাসীন দলের কাঁধে ভর করে। আমার বিশ্বাস, এটা রাজনীতিকরা বোঝেন না, তা নয়। রাজনীতিকদের স্বার্থ উদ্ধার করতে এসব লোকও দরকার হয়। তাই তারা জেগে ঘুমান। এদেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হবে, রাজনীতিকরা জনসেবা করবে এবং সেটা আমি দেখে মরতে পারব– এটা আমার দুরাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের কিছু ভালো মানুষ যারা প্রকৃতপক্ষে দেশ ও সমাজসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতিতে ঢুকেছিলেন, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না বলেই রাজনীতিতে নামমাত্র অবস্থান নিয়ে টিকে থাকতে হচ্ছে। বর্তমানে কোনো সুশিক্ষিত ও নীতিবান লোক, দেশপ্রেমিক দেশসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন না, এটা আমরা খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছি। দিন যত সামনে এগোচ্ছে, রাজনীতি থেকে পচা-দুর্গন্ধের উৎকট মাত্রা ততই বেড়ে যাচ্ছে, যা সমাজ ও পরিবেশকে কলুষিত করে ছাড়ছে। সমাজসচেতন অনেক ব্যক্তি এসব কথা অকপটে বলতেও সাহস পাচ্ছেন না। আবার অনেক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী টকটকে লাল কিংবা গাঢ় হলুদ হাফশার্ট গায়ে জড়িয়ে দেশের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ভালো ভালো আশাজাগানিয়া বাণী শুনিয়ে ফুলের মালা গলায় পরছে। এগুলো আসলে বাস্তবতা বিবর্জিত, আত্মপ্রবঞ্চনা। প্রশ্ন জাগে, আমাদের নতুন প্রজন্ম বিদ্যমান এ পরিবেশ, সমাজ ও রাজনীতি থেকে কী শিক্ষা নেবে বা তারা কেমন শিক্ষায় অভ্যস্ত হবে? আমি খুঁজে পাই এদেশের এ দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ ও অপরাজনীতির অতি দ্রুত আমূল পরিবর্তন। এজন্য যে কোনো বিবেকবান, সচেতন ও সুশিক্ষিত লোককে পরিবর্তনের নেশায় জাতি-গোষ্ঠী, দলমত নির্বিশেষে কায়েমি স্বার্থপর অন্যায়, অবিচার, নিত্যনতুন শোষণ, ও ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে জেগে উঠতে হবে। আমরা সবাই জানি, স্বাধীনতা অর্জনের তুলনায় স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক কঠিন। এদেশের একজন সুনাগরিক হিসাবে এ দায়িত্ব আমাদেরই পালন করতে হবে।

(১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।